Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 20-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট পুরুষ চরিত্র

ড. গোবিন্দ বিশ্বাস

Abstract

Jagadish Gupta is one of the fabulous, powerful writers of the contemporary 'kallol' period. He was different from his contemporary co-writers. This distinctiveness lies in his characterization, plot planning of the story and in the bare exposure of the society. Through this essay, the male characters, created by Jagadish Gupta has been depicted.

In most of his stories, Jagadish Gupta has depicted his male protagonists as selfish greedy, vicious and lustrous.

In 'Bidhaba Ratimanjary', we find Akshay as a barbaric, lusty and shameless man, to whom love is useless or priceless. Physical pleasure or carnal satisfaction is everything to him. Beside being, during the advertisement of Ratimanjary's marriage, the selfishness of Mohonobabu is also revealed through this story.

'Payomukham' is a story, where krishnakanta has murdered his daughter-in-law, one by one with the help of ayurvedic medicine to satisfy his financial greed. But in the long run, he was caught by his son, was assaulted and his hidden identity was exposed.

In the story 'Puratan Vritya', how Naba, a fostered child, slayed his pastored father in the climax due to his economic greed, is shown vividly.

The story 'chandrasurya jotodin' depicts the unscruplours, greedy Dinataran who tortures his first wife too much to make her insane to fulfill his lust.

The barbaric instinct of subol has been nakedly picturized by creating two part in the story 'Adikathar Ekti'.

In 'kolongkito samparka' characterless, lascacious satkori has been thrown in prison being convicted by rape case and after returning home when he fails to satisfy his carnal desire from his wife, he throws her callously in the darkness of world with the help of his mother.

Thus, if we observe the entire literary creation of Jagadish Chandra Gupta, we will find that he is a pessimist. So, his characters never proceed to the way of enlightenment. They stand still in the same darkness, from which they emerged at first.

কল্লোল সমসাময়িক কালের এক আশ্চর্য শক্তিমান লেখক হলেন জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতার বিরোধিতা করে তিনি সাহিত্যে অবতীর্ণ হননি। তিনি সমসাময়িক কালের আরও অন্যান্য লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র্য ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য মূলত তাঁর চরিত্র চিত্রণে, কাহিনির পট-পরিকল্পনায় এবং সমাজজীবনকে নগ্নভাবে প্রকাশ করার মধ্যে। তিনি কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিচিত্র মানুষকে

তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং অর্জন করেছেন বিপুল অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ দিক নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব। সেটি হল জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট পুরুষ চরিত্র। আমরা জগদীশ গুপ্তের কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের পুরুষ চরিত্রকে অবলম্বন করে আলোচনায় অগ্রসর হব। জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট অধিকাংশ পুরুষ চরিত্র স্বার্থপর লোলুপ। এমন কোন গর্হিত কাজ নেই যা তারা পারে না। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা যেমন সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে আবার অন্যেরও চরম ক্ষতি করতে পারে। এমনকি কখনো নিজেরও পতন ডেকে আনে।

জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট পুরুষ চরিত্র পরিকল্পনায় আমরা যে সব গল্পগুলি নির্বাচন করেছি সেগুলি হল-বিধবা রতিমঞ্জরী,পয়োমুখম,পুরাতন ভৃত্য, চন্দ্র-সূর্য যতোদিন, আদি কথার একটি ও কলঙ্কিত সম্পর্ক।

জগদীশ গুপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'বিধবা রতিমঞ্জরী'। এই গল্পে দু'জন প্রধান পুরুষ চরিত্র রয়েছে।

১) অক্ষয়- যিনি রতিমঞ্জরীর স্বামী।
২) মোহন বাবু-যিনি রতিমঞ্জরীর দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে রতিমঞ্জরীর কাছে এসেছেন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।
অক্ষয় রতিমঞ্জরীর স্বামী। গল্পে তাঁর উপাস্থিতি খুবই সামান্য সময়ের জন্য। তবুও এই সামান্য পরিসরে লেখক অসামান্য দক্ষতায় এই চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্ত্রীর ভাবনা ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে।

অক্ষয় দুশ্চরিত্র লম্পট বৈধব্য অবস্থায় রতিমঞ্জরীর ভাবনা ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।স্বামীর মৃত্যুর পর মৃতদেহকে শ্মশানে দাহ করে ফিরে এসে রতিমঞ্জরীকে আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখি। এই দৃশ্য দেখে বোন মনোমঞ্জরী বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং এর কারণ জানতে চাইলে রতিমঞ্জরী জানান 'কাঁদবার কী ঘটেছে? মানুষ মরেছে তার জন্যে তো কেঁদেছি।লোকে দেখেছে'।[১]

অথাৎ রতি যে প্রিয় জনের মৃত্যুতে কেঁদেছে তা নয় । অক্ষয় যে তাঁর কাছে প্রিয় ছিল না 'মানুষ মরেছে' শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তার কান্না যে প্রিয় বিয়োগের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল-সেটাও নয় । মৃত্যুর পর স্বামীর প্রতি তাঁর চরম ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামীকে নিয়ে তিনি সুখী ছিলেন না । কারণ স্বামী তাঁকে ভালোবাসতেন না । তিনি ছিলেন পরনারীতে আসক্ত। তাই স্বামীর মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করেনি। মর্মাহত করেনি। তিনি সধবা থাকতে মনে মনে বৈধব্যকে বরণ করে নিয়েছেন। তাই নতুন করে কাঁদবার মতো কোন ঘটনা ঘটেছে বলে রতিমঞ্জরী মনে করেন না । ফলে বোনকে জানিয়েছেন –

'আমি সধবা বিধবা যা ছিলাম তা-ই আছি ।
তিনি মরে স্বর্গে গিয়ে যদি অমরের দলে মিশে
থাকেন, তবে অন্তরে আমি সধবাই আছি । কাঁদবো
কেন ? আর যদি তিনি একেবারে নিঃশেষ হয়ে
যেয়ে থাকেন, তবু আমি বিধবা নুতন করে হইনি।
তিনি তো আমাকে ভালোবাসতেন না-আমাকে ঘরে রেখে
তিনি বাইরে থাকতেন । তখনই বিধবা হয়ে
কেঁদেছিলাম এখন আবার নুতন করে কাঁদবো
কী! কান্না পায় না'।[২]

স্বামীর মৃত্যুর পর রতিমঞ্জরী সামজিক আচার-আচারণ পালন করলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তিভরে তা পালন করতে পারেননি । তাই শ্রাদ্ধের সময় স্বামীর উদ্দেশে পুরোহিতের নির্দেশ মতো অর্ঘ্য অর্পণ করতে গিয়ে বার বার ভুল করেছেন । লম্পট স্বামীর জন্য এই পবিত্র অনুষ্ঠানকেও তাঁর উপহাস বলে মনে হয়েছে। স্বামীর পারলৌকিক

আত্মার জন্য দানের কথা চিন্তা করে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে পড়েছেন, যা তাঁর ভাবনার মধ্যেই ধরা পড়েছে-

'....চিত্ত যার মালিন ছিলো,যে ব্যক্তি স্ত্রীর উপভোগ্য প্রাণসক্তা আর মধুময় আন্তরিকতা পরিত্যাগ করে পাপে মধুর বিলাসবস্তুর বৈচিত্র্যের আর পণ্যরূপের আর দেহের সন্ধানে কেবলই হা হা করে বেড়িয়েছে, শত শত বার উচ্ছিষ্টীকৃতা নারীর মতো জঘন্য জিনিস যে-ব্যক্তি অপার লোলুপতার সঙ্গে টেনে টেনে নিয়েছে,সে ব্যক্তির উদ্দেশে এই পবিত্র অনুষ্টান বা এই অনুষ্টানের পবিত্রতা উপহাস ব'লে মনে হ'লে দোষ কী'। অক্ষয় রতিমঞ্জরীকে বিবাহ করে বধূহিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি দিলেও তাঁকে কোনোদিন সম্মান করেননি । তাই রতির ভাবনায় পাই-

'তার স্বামী যে নারীকে আমরণ খুঁজে ফিরেছেন সে কেবল নারী-অপবিত্র মনে কেবল অঙ্কশায়িনী করতে তিনি নারীকে খুঁজেছিলেন স্ত্রী বলতে যা বুঝায়, তাকে তিনি খোঁজেন নাই....তাকে পেয়ে তিনি স্ত্রীরত্ন লাভের আনন্দ অনুভব করেন নাই ধন্য হন নহি কেবল নারীরই রূপ আর দেহ তার রূপে আর দেহে তিনি সম্ভোগ করে গেছেন অন্তরে কামনা করেন নাই পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই.... তাকে তিনি অশুচি স্পর্শ দিয়ে দিয়ে অশুচি করে রেখে গেছেন' ।

শুধু তাই নয় অক্ষয় তাঁকে আজীবন নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে লোলুপতার সঙ্গে ভোগ করে গেছেন । তাই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ভালোবাসা জন্মানো স্বাভাবিক ছিল তা রতির মনে কোনোদিন জন্মায় নি বরং অক্ষয়ের প্রতি তাঁর মনে হয়েছে –

' এই দেহ ভোগ করবার যোগ্যতা যার
ছিলনা – সে কেন তা করে গেছে' ।

আবার আমরা একসময় দেখি অক্ষয়ের কাছে পিতৃত্ব নয়-জৈবিক তাড়নাই বড় হয়ে উঠেছে । তাঁর এই ভোগ-বাসনা এতটাই প্রবল ছিল যে তাঁদের দু'সন্তানের একজন গর্ভে আর একজন ভূমিষ্ঠ হবার পর মারা গেলে অক্ষয়কে বিন্দুমাত্র শোকাহত হতে দেখি না বরং সন্তান না জন্মনোর জন্য তিনি বহুবার পুলক ব্যক্ত করেছেন । অর্থাৎ আমৃত্যু স্ত্রীর সুধা পান করতে চান তিনি । অক্ষয়ের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা বনফুলের 'বুধনী' গল্পের বিল্টুর মধ্যেও লক্ষ করি । পার্থক্য একটাই সে ছিল আদিম জনজাতির আর অক্ষয় তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষ ।

স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য রতিমঞ্জরী 'জনজাগরণ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন । আর এই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরেই আমরা একটি আড্ডার আসরে উপস্থিত হতে দেখি মোহন বাবুকে । মোহন বাবু চরিত্রটি যে সুবিধাবাদী,স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক তা বোঝা যায় বৈঠকে তাঁর নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে । আবার রতিমঞ্জরীকে দেখতে আসার পর তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়েও লেখক মোহন চরিত্রের নানা অন্ধকার কোনে আলো ফেলেছেন । মোহনবাবু যে রতিমঞ্জরীর বৈধব্য যন্ত্রণাকে দূর করার জন্য রতিমঞ্জরীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয়েছেন তা নয় । তাঁর এই আগ্রহ মূলত তাঁর নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য । রতিমঞ্জরীর দেওয়া বিজ্ঞাপনটিকে তিনি নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন রতিমঞ্জরীকে বিবাহ করলে তাঁর অধিকাংশ স্বার্থ সিদ্ধি সম্পূর্ণ হবে । রতি মঞ্জরীকে বিয়ের মধ্যে দিয়ে মোহনবাবুর বন্ধুরাও তাঁকে লাভবান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

রতিমঞ্জরীকে বিবাহ করলে মোহনবাবু কতো দিক থেকে লাভবান হবে তা মোটামুটি ভাবে নিম্নরূপ –

ক) যে বিধবা বিবাহ করার বাসনা প্রকাশ করে নিজে বিজ্ঞাপন দিতে পারে তাঁর আত্মীয় স্বজন না থাকারই কথা।

খ) রতিমঞ্জরীর কোন সন্তান না থাকার ফলে তাঁকে দিয়ে মোহনবাবু নিজের সন্তান পালন করতে সক্ষম হবেন ।

গ) যে পুনর্বিবাহের বিজ্ঞাপন দিতে পারে তাঁর ধন সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণ থাকাই স্বাভাবিক ।

ঘ) এই বিবাহের ফলে ছোট চারটি সন্তান পালনের দায়িত্ব থেকে বড় মেয়ে মোহনাকে মুক্তি দিতে পারবেন মোহনবাবু ।

ঙ) বিধবা বিবাহ করার মধ্যে সংস্কারের শিকল ছিন্ন করার যে দুঃসাহসিকতা রয়েছে তার সুবাদে যে শোভনার সৎপাত্র জুটে যেতে পারে তারও সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা করেছেন ।

মোহনবাবুর উপরিউক্ত গুলির মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয় তিনি কতো বড় আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর চরিত্র । আপন স্বার্থ সিদ্ধিছাড়া অন্য কারো কথা ভাবা তাঁর ভাবনাতেই ছিল না । রতিমঞ্জরীরও যে কিছু চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে তা একবারও বিবেচনা করেননি । তাই রতিমঞ্জরী মোহনবাবুর সন্তানদের মানুষ করতে হবে কিনা জানতে চাইলে মোহনবাবু জোড়ের সঙ্গে জানায় 'তা করতে হবে বৈ কি!' অর্থাৎ বিয়ে হলে মোহনবাবুর সন্তানদের রতিমঞ্জরী মানুষ করতে বাধ্য এমনই একটি দাবী ধ্বনিত হয়েছে মোহনবাবুর কণ্ঠে । এই দাবীর সত্যতা আমরা খুঁজে পাই লেখকের বয়ানে । মোহনবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের সচেতন উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক লিখছেন –

'মোহনবাবু এই অবস্থায় বিবাহ করতে
চান আত্মরক্ষার্থে,গৃহ রক্ষার্থে, এবং
সন্তান রক্ষার্থে' ।

মোহনবাবু তাঁর স্ত্রীকে যে কতটা ভালোবাসতেন সে বিষয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে রতির মনে । তাই তিনি মোহনবাবুকে বলেছেন –

'বিয়ে করে স্ত্রীকে দিয়ে আপনি কেবল
সুলভ মূল্যে গণিকাবৃত্তি করিয়েছেন' ।

এছাড়া রতিমঞ্জরীর দিকে মোহনবাবু যে লালসার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন তাত্তি রতিমঞ্জরীর চোখ এড়ায়নি ।এজন্য মোহনবাবুকে তিনি তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন –

'অস্বীকার করবেন না , লালসা আপনার চোখে মুখে আমি
দেখছি- শারীরিক উত্তেজনা লক্ষ্য করেছি।আপনি যান' ।

রতিমঞ্জরীর ভাবনাতেই মোহনবাবুর চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তাঁর স্বামী যেরকম নির্লজ্জ লাম্পট্য নিয়ে তাঁকে ভোগ করে গেছেন এই ব্যক্তিত্ত অর্থাৎ মোহনবাবুও রতিমঞ্জরীর জীবনে এসেছে তাঁর স্বামীর দোসর হয়ে, পাপের দ্বিতীয় দূত হয়ে ।

এই গল্পে অক্ষয় মোহনবাবু ছাড়াও কয়েকটি গৌণ পুরুষ চরিত্র রয়েছে । তাঁদের মধ্যে অক্ষয়ের পিতা গোকুলেশ্বর, বাড়ির চাকর নন্দ এবং মোহনবাবুর আড্ডার কয়েকজন বন্ধু ।অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে অক্ষয়ের পিতা গোকুলেশ্বরকে আমরা দেখতে পাই ঠিক,প্রতারক হিসেবে ।প্রতারণা করে তিনি পরের সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন । তবে একথা ঠিক এই সকল অপ্রধান চরিত্রগুলি 'বিধবা রতিমঞ্জরী' গল্প তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করেনি ।

'পয়োমুখম' গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র কৃষ্ণকান্ত ।তিনি বিকৃত অর্থলোভী সুচতুর ব্যক্তি । তাঁকে কেন্দ্র করেই গল্পটি আবর্তিত । তিনি এতটাই অর্থলোভী পিশাচ ছিলেন যে ছেলেকে কবিরাজী শিক্ষা দেওয়ার পিছনেও তাঁর একটা গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল । ছেলেকে কবিরাজী বিদ্যায় পারদর্শী করে চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন নয় । তিনি চেয়েছেন ছেলেকে ধনী পরিবারে বিয়ে দিয়ে মোটা পণ আদায় করতে । তাই আমরা তাঁকে দেখি ছেলের ভূতনাথের বিবাহের পূর্বে তিনি সুকৌশলে ছেলের গুনাগুন বৈবাহিক মহলে প্রচার করেছেন –

'ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীগোলককৃষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র.....
ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রকৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে ।।.... আরো বলিলেন,
দু-তিনটি পাশাকরা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ-বাইশ টাকার অধিক নয়; আয়ুর্বেদের দিকে
দেশের নাড়ির টান যথার্থই ফিরিয়াছে;সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না;

নয় বছরের মণিমালার সঙ্গে ভূতনাথকে বিয়ে দিয়ে আদায় করলেন নগদ সাতশ টাকা ।আদায় শেষে যখন তিনি বুঝলেন আর অর্থ আদায়ের কোন পথ নেই তখন পুত্রবধূর সামান্য জ্বরের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কবিরাজী বড়ি খাইয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন । লেখক জানিয়েছেন –

'শেষ রাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দু-টার সময় মণির নাড়ি ছাড়িয়া গেলো ।
সিঁদুর লইয়া, লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি
মনি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলো' ।

কিছুদিন পরে কৃষ্ণকান্ত আবার ভূতনাথকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন অনুপমার সঙ্গে । তবে এবার পণের পরিমান পাঁচশ টাকা এবার দ'শ টাকা লোকসানের কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন –

' মণি মরিয়া পাত্র হিসাবে ভূতনাথের
জীবন খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে;'

তাই সামান্য লোকসানেই তাঁকে ছেলের বিবাহ দিতে হয়েছে । তবে এই লোকসান তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর অর্থলিপ্সা দিন দিন বেড়েই গেছে । তাই সুন্দরী অনুপমাকেও মণির পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে । লেখক জানিয়েছেন –

' অনুপমা মণিমালার অনুগমন করিলো'।

অনুপমার মৃত্যুতে স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও পুত্র ভূতনাথ শোকাহত হয়েছে । কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ধ্যান কৃষ্ণকান্ত দেন নি। শুধু মিষ্টি কথায় তাদেরকে বারবার সান্ত্বনা দিয়েছেন ।

অনুপমার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকান্ত পুনরায় ছেলের বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন ।ভূতনাথ কিছুতেই বিবাহ করতে রাজি না হলে কৃষ্ণকান্ত তাকে শাস্ত্রের ও লোকাচারের দোহাই দিয়ে পুত্রের পণ ও পাত্রী দুটোই ঠিক করে রেখেছিলেন । এবার পণ আটশ টাকা । ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে 'আরো খানিকটা খাদ' মিশলেও পাত্রীর রঙ কালো থাকায় হঠাৎ পণের পরিমাণ বেড়ে যায় । এবারের কন্যা বধূটির নাম বীণাপাণি গায়ের রঙ কালো হলেও পূর্ব দুই সপত্নী আপেক্ষা বেশ কিছু ভালো গুণ রয়েছে তার । সে অতিশয় শান্ত, তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন সকলের সঙ্গে সহজেই সে মিশতে পারে । সে আসার ফলে স্বামী ভূতনাথেরও পসার বেড়েছে দ্রুত ।

কিন্তু এই সমস্ত চারিত্রিক মাধুর্য কৃষ্ণকান্তের পাষাণ হৃদয়কে স্পর্শ করেনি । তিনি পুত্রবধূর গায়ের রঙ কালো হওয়ার জন্য নির্লজ্জের মতো বীণাপানির বাবার কাছ থেকে প্রতিমাসে অর্থ আদায় করেছেন এবং ছেলের ভাতে ধরা পড়েও ছেলের শ্বশুর বলরাম দাসের কথায় অপমানিত হয়ে পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার বীণাপানির জ্বর হলে তাকেও কলেরার ঔষুধ দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চক্রান্ত ছেলের কাছে ধরা পড়ে যায়।

অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তকে আমরা দেখতে পাই তিনি প্রথম থেকেই অর্থের পেছনে ছুটতে ছুটতে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে উঠেছেন। পুত্রের তিন বার বিবাহ দিয়েও তাঁর অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ হয়নি। শুধু তাই নয় পুত্র, স্ত্রীর মানসিক যন্ত্রনাকেও তিনি গুরুত্ব দেননি। শুধু ছেলেকে অবলম্বন করে ব্যবসা ফেঁদে গেছেন।

জগদীশ গুপ্ত 'পয়োমুখম' গল্পটিতে কৃষ্ণকান্তের মতো বিকৃত চরিত্র সৃষ্টি করে ঘুণ ধরা ধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থার একটি বিরল দিককে উপস্থাপিত করেছেন। তাই এই চরিত্রটিও হয়ে উঠেছে এক বিরল সৃষ্টি। পুরাতন ভৃত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চির প্রচলিত বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পে। রবীন্দ্র-বীক্ষায় পুরাতন ভৃত্যের উপর অগাধ ভরসা ও আস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে জগদীশ গুপ্তের গল্পে। 'পুরাতন ভৃত্য' রবীন্দ্রনাথের এক বহুল জনপ্রিয় কবিতা । জগদীশ গুপ্তও লিখেছেন একই শিরোনামে একটি ছোট গল্প। তবে নাম এক থাকলেও জগদীশ গুপ্ত গল্পের আখ্যায়িকা নির্মানে রবীন্দ্রনাথের পথ পরিহার করে সম্পূর্ন ভিন্নপথে হেঁতেছেন। এই গল্পে আমরা প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসেবে পাই নবকে (বিন্ধ্যপ্রসাদ)।সে রবীন্দ্রনাথের কেষ্টর একেবারে বিপরীত। তার এই বিপ্রতীপতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, প্রভু ভক্তিতে।

বিশ্বেশ্বর ও তাঁর স্ত্রী ক্ষেমেঙ্করী জাতপাতের তোয়াক্কা না করে পুত্র স্নেহে থেকে (বিন্ধ্যপ্রসাদ) কাছে টেনে নিয়েছেন । বিশ্বাস করেছেন। ভরসা করেছেন। কিন্তু নব সন্তানতুল্য স্নেহ ভালোবাসা পেলেও তার মধ্যে কোন কৃতজ্ঞতা বোধ,মমতা বোধ জেগে ওঠেনি। বিশ্বেশ্বর স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাতাশ বছরেরে তরতাজা পুত্র নবর উপর ভরসা করেছিলেন। তাই তিনি স্ত্রীর শ্রাদ্ধের অর্থ জোগার করার ভাগ্য পুথকে সঙ্গে নিয়ে শিষ্যদের বাড়ি ঘুরেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সাতাশ টাকা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে কিছুটা স্বস্তির নিঃশেষ ফেলেছেন । কিন্তু তাঁর স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কল্পিত ভয় বাস্তবে পরিণত হয়;তৃতীয় কোন ব্যক্তির আগমনে নয়;তারই পালিত পুত্র নবর আঁচরণে –

'নব বাঁ হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল । ...ছোরা দেখিয়া বিশ্বেশ্বরের শীর্ণ দেহ আর খাড়া থাকিতে পারিল না; টাকার থলিটা তাহার দিতে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,...টাকা নে,কিন্তু প্রাণে মারিসনে,বাবা'
পুত্রের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন ও ব্যর্থ হয়।নব তার পালক পিতাকে ছুরিআঘাত করে সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় ।

পিতৃতুল্য প্রভুর প্রতি নবর এই দস্যুবৃত্তি আচরণ যে কোন পাঠককে থমকে দাঁড়িয়ে নতুন করে কিছু ভাবতে শেখায় । দারিদ্র্য মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে শিথিল করে দেয়, নব যেন তা প্রমান করেছে।

জগদীশ গুপ্ত মানব জীবনের কোন স্থির আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন না । মানসিক ভারসাম্য ও নীতিবীধের বিচলন তাই তাঁর গল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয় । মানুষের প্রবৃত্তি জগতে বাৎসল্য,শ্রদ্ধা, ভালোবাসা যেমন সত্য নিষ্টুরতাও তেমনি সত্য এ কথাই যেন নব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ।'চন্দ্রসূর্য যতোদিন' গল্পটি পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর আত্নযন্ত্রণার গল্প । এই গল্পে আমরা প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসেবে পাই দীনতারণকে। সে বিবেখীন,লোভী। ক্ষণপ্রভাকে বিয়ের পরে একটি সন্তান হলেও শুধুমাত্র বয়সের দোহাই (মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি) দিয়ে পিতা মাতার নির্দেশে প্রথমা স্ত্রী ক্ষণপ্রভাব বোন প্রফুন্নকে বিয়ে করেছে ।এই বিবাহের ক্ষেত্রে সে তার পিতা এবং পিতামহকেও ছাড়িয়ে গেছে । তার পিতা এবং পিতামহ দু'বার করে বিবাহ করলেও প্রথমা স্ত্রীর জীবৎকালে কেউই তা করেননি । কিন্তু দীনতারণ প্রথমা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শ্বশুরের সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বিয়ে করেছে। লেখক জানিয়েছনকে

> ' এক স্ত্রী বর্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ
> করিবার কারণ শ্বশুর মহাশয়ের সম্পত্তি'।

শুধু তাই নয় যুবতী নারী ভোগের আকাঙ্ক্ষাও তার গুপ্তমনে কাজ করেছে। প্রথমা স্ত্রীর যন্ত্রণা তাকে বিন্দুমাত্র আঘাত করেনি । ক্ষণপ্রভা স্বামী ও সন্তানকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিল।কিন্তু দীনতারণ শুধুমাত্র দুই নারীকে নিয়ে ভালোবাসার খেলা খেলে গেছেন। প্রতারণা করেছে আবার ভোগের লালসায় নিজ সন্তানকেও অবহেলা করেছে । তার মধ্যে কোন পিতৃত্ব বোধ জেগে ওঠেনি ।

শেষে আমারা ক্ষণপ্রভাবে দেখি স্বামীর লোভ লালসার যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে মানসিক যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে পথে বেরিয়েছে।

অর্থাৎ এই গল্পে লেখক দীনতারণকে বিকৃত লোভী হিসেবে অঙ্কন করেছেন । তার কাছে সম্পত্তি আর দেহজ ভোগ ছাড়া আর কোনকিছুই মূল্য পায়নি ।

পুরুষের এই জৈবিক প্রবৃত্তি যেন চন্দ্র সূর্যের মতোই চির- সত্য,শ্বাশ্বত।আদি-অনন্তকাল ধরেই- পুরুষের রক্তে বহমান হয়ে চলেছে তাদের এই বিকৃত নগ্ন জৈব প্রবৃত্তি যা কোন দিনই শেষ হবে না । বরং চলবে অনন্ত কাল ধরে গল্পের 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' নামকরণের মধ্যে দিয়ে লেখক এমনই ব্যঞ্জনা দিয়েছেন ।

'আদি কথার একটি' গল্পে আদিমতার নগ্ন রূপের পাশাপাশি লেখক মনস্তত্ত্বকে সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে দুটি কাহিনি রয়েছে । প্রথমটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রকাহিনি । আর দ্বিতীয়টি হল এই গল্পের মূল কাহিনি । দুটি কাহিনিতেই রয়েছে দু'জন প্রধান পুরুষ চরিত্র ।

দু'জন পুরুষ চরিত্রকেই লেখক আদিম মানুষের প্রতিনিধিরূপে অঙ্কন করেছেন ।

প্রথম কাহিনির পুরুষ চরিত্রটি হল বেণী । সে অত্যন্ত নির্দয়, নিষ্ঠুর এবং সন্দেহ প্রবণ । পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে শুধুমাত্র এই সন্দেহে নৃশংসভাবে তাকে মাথা কেটে হত্যা করেছে । শুধু স্ত্রীর ক্ষেত্রেই নয়,পাড়ার লোকের কাছেও তার আচার-আচরণ কেমন ছিল তা আমরা জানতে পারি লেখকের বর্ণনায় –

' বেণী দাসই ছিলো পাড়ার বিভীষিকা; সকলের বড়ো ঠ্যাঁটা, বদরাগী.....'

স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তার মনের সন্দেহের সত্যমিথ্যা সে যাচাই করেননি। কারণ স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না তার । শুধুমাত্র সন্দেহের উপর ভর করে একটি নিস্পাপ প্রাণকে অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে । বেণী চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপীয়ারের 'অথেলো' নাটকের ওথেলো চরিত্রের মিল পাওয়া যায় । তবে স্ত্রীকে খুন করার পর ওথেলোর মধ্যে অনুশোচনা দেখা দিলেও বেণী চরিত্রে তা নেই । প্রকৃতপক্ষেই এমন একগুঁয়ে বদরাগী চরিত্র জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে বিরল ।

এই গল্পের দ্বিতীয় আখ্যানটিতে রয়েছেসুবল । সুবলকে লেখক আখ্যানের শুরুতে দ্যালু, সাহায্যকারী ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরলেও ক্রমশ তার চরিত্রের আদিমতাকে নগ্ন ভাবে তুলে ধরেছেন ।

কাঞ্চনের স্বামী গোপাল মারা গেলে আনাথ কাঞ্চনকে সাহায্য করার জন্য তার মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এবং বিবাহও করেছে । এখানে পাঁচ বছরের খুশিকে বিবাহ করার প্রস্তাব উপলক্ষ্য মাত্র-সুবলের নিশানা বা লক্ষ্য হল সদ্য বিধবা যুবতী কাঞ্চন । তাই বিবাহের দিন কয়েক পরেই আমরা সুবলের মনের সুপ্ত বাসনার প্রকাশ দেখতে পাই । চালের ধামা জালায় তুলতে গিয়ে কোমরে আঘাত পেলে শাশুড়ী কাঞ্চন এগিয়ে এসেছে সাহায্যের জন্য । কোমরে তেল মালিশ করে দিয়েছে ।আর এখান থেকেই সুবলের মনের গোপন বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে –

'হঠাৎ সুবল উঠিয়া বসিয়া যে-হাত দিয়া কাঞ্চন অন্যমনস্কের মতো তার কোমরে তেল মালিশ করিতেছিল, সেই হাতখানাই সে খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল!'

এরপর সুবলের আকাঙ্ক্ষা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হলে সে হিংস্র হয়ে উঠেছে । পাঁচ বছরের স্ত্রী খুশির পেটে লাথি মেরেছে । কাঞ্চুনের কাছেও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খুশিকে বিবাহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য । তাই সে শিউরে উঠেছে বারবার । তবে আমরা লক্ষ করেছি ক্রমশ অতিধীরে বিভিন্ন কার্যকারণ সূত্রে কাঞ্চনের মনেও একটু একটু করে গোপন বাসনা জেগে উঠেছে । তবে আদিমতা জেগে উঠলেও সে নারীত্ব আর মাতৃত্বের যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে । তার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দোলাচালতা দেখেছি বারবার –

'.....আসহ্য আত্মগ্লানির সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে লাগিল যতোদূর কঠোর হইয়া থাকা তার উচিত, ততো কঠোর সে হইতে পারে নাই। আপন পেটের মেয়ের প্রতি তাহার যে কর্তব্য সে- কর্তব্য সে পালন করিতেছে না'। তবে কঞ্চনের মনের এই চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য সুবলই দায়ী। সে তার স্ত্রীকে মাঝখানে রেখে বিভিন্ন কৌশলে কাঞ্চনকে প্রভাবিত করেছে কখনো অভিমান করে না খেয়ে, আবার কখনো গৃহত্যাগ করে চলে গিয়ে।

কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে আমরা শেষপর্যন্ত কঞ্চনকেই অধিক লাঞ্ছিত হতে দেখি। পিসির নালিশে গ্রামের মাতব্বর বামনদাস অধিকারী কাঞ্চনকে গ্রেপ্তার করে এনেছে, জন সমক্ষে তার চুলধরে মাটিতে ফেলে জুতোপেটা করেছে। এমনকি সমস্ত দোষ কাঞ্চনের উপর নিক্ষেপ করে অনায়াসেই বলেছে –

' মেয়ে মানুষে আশকরা না দিলে বেটাছেলের সাধ্য কি তার কাছে আগোয়'।

অর্থাৎ সমাজ শাসক বিচার বিবেচনা না করে পুরুষের পক্ষই অবলম্বন করেছে। কারণ সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি।

গল্পে দেখা যায় একজন পুরুষই বিভিন্ন কৌশলে কাঞ্চনের মনের সুপ্ত কমনা –বাসনা গুলিকে জাগিয়ে তুলেছে। আর অন্য পুরুষ এজন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুবল চরিত্রকে নিয়েই এই গল্পের কাহিনি বয়ন করেছেন লেখক। একদিকে সুবলের মনের কমনা-বাসনা অপরদিকে কাঞ্চনের মনে জেগে ওঠা কামনা –বাসনা ও দ্বিধা সঙ্কাচ এই দুয়ে মিলে গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

'কালঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পটি একটি মানবিক সংকটের গল্প। আত্মদংশনের গল্প। এক প্রতিবাদী নারীর গল্প আমরা এখানে প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসেবে পাই সাতকড়ি বা সাতুকে। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি সে দেড় বছর পর জেলে খেটে আগামীকাল বাড়িতে ফিরবে। এই খবরে বাড়ির সবাই খুশি হলেও শুধু খুশি হয় নি তার স্ত্রী মাখন বালা স্বামী যে দুশ্চরিত্র লম্পট ছিল তা বিবাহের পর থেকেই সে জানত। কারণ শাশুড়ী ছেলেকে শাসনে রাখতে না পেরে বৌমার উপরেই সমস্ত দায়-দায়িত্ব দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। তাই বিবাহের পরই নানা আভাসে ইঙ্গিতে তাকে জানিয়েছিলেন। ছেলের বন্ধন শৃঙ্খলা ও মান যে একমাত্র স্ত্রী সে কথাও তিনি বারবার বলেছেন। তাই কর্তব্যের খাতিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়েও নিয়েছিলেন। তার ভাবনায় জানতে পারি –

'সুখের হোক,দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিলো সুখে-দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা- অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিলো, অভিমানবোধ ছিলো; আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিলো'।

কিন্তু সব দিক থেকে মানিয়ে নিয়েও মাখন শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ধর্ষণের দায়ে জেলে গেল সাতু।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কাউকে পাশে পায়নি মাখনবালা। উপরন্ত স্বামীর জেলে যাওয়ার দায় বর্তেছে তার উপরে কারণ অনেকের মনে হয়েছে স্বামীকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে মাখন বালা। তাই মাখন আজ লজ্জায় মূহ্যমান। তার মনে হয়েছে –

'একটা ছি ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছাড়াইতে যেখানে
যতোদূরে মানুষ বাস করে, প্রাসাদে কুটিরে, পথে-পাথরে, পৃথিবী যেখানে সত্য
সত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে'।

এই দুর্বিষহ ঘৃণা লজ্জায় আজ সে পরাজিত। তার কাছে সাতুর এই জেল জীবনের দেড় বছর সময় যেন খুবই সামান্য –

'মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে; নিঃশ্বাসটি শেষ করিয়া
ফেলা হয় নাই; বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্বহ হইয়া আছে। ইহার মধ্যে দেড়

বৎসর কাটিয়া গেল' ।

সাতু যেদিন বাড়িতে ফিরবে সে দিনই সকালে মাখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে । জানা যায় সারারাত সে দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেননি । যথারীতি সন্ধ্যায় পর অন্ধকার সাতু বাড়ি ফিরে এলে মা- দাদা আর বাড়ির সবাই অর্ভ্যথনা জানালেও মাখন তা পারেননি । বাড়ি ফেরার পর বৌদি গোলাপ সাতুকে ভালো আছে কিনা জানতে চাইলে একগাল হেসে জানায় 'তোমাদের আশীর্বাদে' । অনুশোচনা ও অনুতাপহীন একগাল হাসির মধ্যে দিয়ে সে নিজের কুশল বার্তা প্রদান করেছে । অর্থাৎ তার না বলা কথাটি হল এই তোমাদের আশীর্বাদে ভালো আছি । ধর্ষণের দায়ে তার অভিযুক্ত হওয়া এবং দেড় বছর জেল খাটা যেন তার জীবনের একটি তুচ্ছতাচ্ছিল ঘটনা । এই সংক্ষিপ্ত ভাষণেই তার চরিত্র সম্পর্কে বুঝে নিতে পাঠককে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না ।

বাড়িতে এসেই প্রথম রাত্রে মাখন বালকে নির্লজ্জের মতো ভোগ করতে চেয়েছে । দেড় বছর জেল খাটার পরও তার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই । স্ত্রীকে সম্মান করতে শেখেনি । শুধু পাশব প্রবৃত্তি নিয়ে তাকে ভোগ করতে চেয়েছে। এবং সেটাতে বাধা পেলে মিথ্যে নালিশ করে মায়ের সহায়তায় তাকে শূন্য অন্ধকার পৃথিবীর মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাই সাতু দুশ্চরিত্র । ধর্ষণ করেছে । শাস্তি স্বরূপ জেল খেটেছে তারপর বাড়ি ফিরেছে । বাড়ি ফিরে স্ত্রীর মানসিক যন্ত্রনাকে বিন্দুমাত্র উপলব্দি করার চেষ্টা করেনি বরং স্ত্রীকে ভোগে ব্যর্থ হলে তাকে বাড়ি ছাড়া করেছে । এমন বিবেকহীন নির্দয় চরিত্রই জগদীশ গুপ্তের গল্পে।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে দেখা যায় জগদীশ গুপ্তের লেখায় যেখানেই জীবনের জট জটিলতা এসেছে সেখানেই পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকটা দায়ী । তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলি নারী চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশি নির্দয়, নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড । এছাড়া জটিল মানসিকতা বা সুপ্ত গ্লানিবোধ যখন দাম্পত্য জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে সেখানেই পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকটাই স্বার্থপরের মতো দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে । চরিত্রের এই স্বার্থপর রূপ, ভেতরের কুৎসিৎ অন্ধকারকেই জগদীশ গুপ্ত নগ্নভাবে প্রকাশ করেছেন । তবে ভালো-মন্দ জীবনের দুটি-দিক । এই দুটি দিক নিয়েই মানব জীবন । মানব চরিত্র। স্বাভাবতই জগদীশ গুপ্তের বহু খারাপ চরিত্রের পাশে এসেছে কিছু ভালো চরিত্র । যেমন কৃষ্ণকান্তের পুত্র ভূতনাথ (পয়োমুখম),স্নেহ পরায়ণ বিশ্বেশ্বর (পুরাতন ভৃত্য) ইত্যাদি । তবে ভালো চরিত্র অঙ্কন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না তারা এসেছে আখ্যানের স্বাভাবিক নিয়মে । প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ চরিত্রের মধ্যেই কোন উত্তরণ নেই, আলো নেই, আছে শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার । তাঁর চরিত্রগুলি যে অন্ধকার থেকে উঠে আসে পরিণতিতেও তারা সেই বিশ্বব্যাপী অন্ধুকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় । এদিক থেকে জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্য এক ব্যতিক্রমধর্মী লেখক ।

তথ্যসূত্রঃ

জগদীশ গুপ্তর গল্প,সম্পাদনাঃসুবীর রায় চউধুরী,পুনর্মুদ্রণঃ জানুয়ারীঃ-

১) তদেব,পৃ-২১
২) তদেব,পৃ-২১
৩) তদেব,পৃ-২২
৪) তদেব,পৃ-৩০
৫) তদেব,পৃ-৩১
৬) তদেব,পৃ-৫৩
৭) তদেব,পৃ-৪২

৮) তদেব,পৃ-৫৪
৯) তদেব,পৃ-৫৫
১০) তদেব,পৃ-৬৫
১১) তদেব,পৃ-৬৬
১২) তদেব,পৃ-৬৭
১৩) তদেব,পৃ-৭০
১৪) তদেব,পৃ-১৯৩
১৫) তদেব,পৃ-৮৬
১৬) তদেব,পৃ-১০০
১৭) তদেব,পৃ-১০১
১৮) তদেব,পৃ-১০৪
১৯) তদেব,পৃ-১১১
২০) তদেব,পৃ-১৯১
২১) তদেব,পৃ-১৮২
২২) তদেব,পৃ-১৮১
২৩) তদেব,পৃ-১৮৭